ঠিকানা

সুব্রত রায়

অ্যাডিশনাল অঙ্ক দিয়ে আমাদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো। আমরা তিনজন জগবন্ধু স্কুলের গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ক্লাস থ্রি থেকে আমরা একসঙ্গে পড়ছি। এবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আমার বাবা ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা। আটমাস আগে দিল্লিতে বদলি হয়ে গেছেন। আমার পরীক্ষার জন্য আমি আর মা কলকাতায় থেকে গেছি। এবার আমরা দিল্লি চলে যাবো। বাসবের অবস্থাও তাই। ওর বাবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ করেন। জানুয়ারি মাসে বদলির চিঠি এসে গিয়েছিলো। পরীক্ষার জন্য সেটা তিনমাস ঠেকিয়ে রেখেছেন। চন্দন অবশ্য কলকাতাতেই থাকবে। লেখাপড়াতে আমরা তিনজনেই ভালো। পরীক্ষা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। তিনজনেই তিন চারটা করে লেটার পাবো। লেখাপড়ার জন্য আমাদের স্কুলে প্রতি ক্লাসে অনেক প্রাইজ আছে। এতদিন সব প্রাইজগুলি আমরা তিনজন ভাগ করে পেয়ে এসেছি। আমার নাম অর্ণব। তাই স্কুলে আমাদের পরিচয় ছিলো এ-বি-সি হিসাবে। পণ্ডিত মশাই আমাদের ডাকতেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

বাসবের ইচ্ছা ডাক্তার হবার। চন্দন শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে ঠিক করে রেখেছে। দিল্লিতে আমি অর্থনীতি পড়ব।

আমরা জগবন্ধু স্কুল থেকে বের হয়ে ফার্ন রোড় দিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম। মোড়ের দোকানে সিঙাড়া ও সন্দেশ খেয়ে আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে গোলপার্ক পৌঁছলাম। অন্যদিন আমাদের কথা শেষ আর হয় না। আজকে আমরা কেউই কথা বলছি না। বাসব হঠাৎ বললো - চল, লেকে একটু বসা যাক। মার্চ মাস। রোদ বেশ চড়া। আমরা গাছের তলায় একটা বেঞ্চে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। আমরা কেউই কথা খুঁজে পাচ্ছি না। চন্দন বললো - আমার পণ্ডিত মশাই এর কথা মনে হচ্ছে। কি একটা সমাস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাসব আর আমি উত্তর দিতে পারলাম না। পণ্ডিত মশাই বললেন, দাঁড়িয়ে থাক। অর্ণব উত্তর দিয়ে দিলো। পণ্ডিত মশাই বললেন, তুইও দাঁড়িয়ে থাক। অর্ণব বললো, আমি তো ঠিক উত্তর দিয়েছি। আমি কেন দাঁড়াব? পণ্ডিত মশাই বললেন, তোরা তিনজন সবসময় একসঙ্গে থাকিস। ওরা পারেনি। তার ফলটা তোকেও ভোগ করতে হবে। বাসব বললো, তোদের মনে আছে একদিন ভূগোলের ক্লাসে আমরা ভূগোল বই এর মধ্যে গল্পের বই রেখে তিনজনে পড়ছিলাম? চন্দন বললো - মনে নেই আবার। ও হেনরির ছোটো গল্প। অমূল্যবাবু হেডস্যারের কাছে নালিশ করলেন। ছুটির পর হেডস্যার আমাদের তিনজনকে ডেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে বললেন, কি বই তোরা পড়ছিলি? আমি বললাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম বেতের বাড়ি খাবো। বাসব বললো, স্যার যখন শুনলেন ও হেনরির ছোটো গল্প তখন বললেন ওর থেকে একটা গল্প বল। আমি তখন After Twenty Years গল্পটা বললাম। স্যার বললেন, আর কোনো দিন যেন শুনিনা

ক্লাসের সময় গল্পের বই পড়ছিস। বলে নিজের আলমারি খুলে একটা বই বার করে বললেন, এটা তোরা পড়ে ফেরত দিবি। এখানে আমাদের যা কথা হলো এই ঘরের বাইরে যেন না যায়। বাইরে এসে দেখি বইটা মোপাসাঁর ছোটো গল্পের সংকলন। চন্দন বললো - এক কাজ করলে হয় না। আমাদের বয়স এখন প্রায় ষোলো বছর। তিরিশ বছর পর আজকের তারিখে তিনজনে এইখানে হাজির হলে কেমন হয়? তখন আমাদের বয়স ছেচল্লিশ বছর হবে। আমি বললাম ভালো প্রস্তাব। তবে এখানে নয়। আমাদের স্কুলের বড়ো গেটটার সামনে সকাল সাতটার সময়, উনিশ-শো ছিয়াশি সালের নয়ই মার্চ। সকাল সাতটা হলে পুরো দিনটা পাবো। বাসব বললো - সে তো না হয় হলো। কিন্তু ও হেনরির গল্পের শেষটা মোটেই ভালো নয়। কুড়ি বছর পর একজন পুলিস অফিসার আর একজন চোর। পুলিস অফিসার নিজে তার বন্ধুকে গ্রেফতার না করে আর একজন অফিসারকে পাঠালো বন্ধুকে গ্রেফতার করার জন্য।

(২)

ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকেনা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি করে আমি আমেরিকা গেলাম পোস্ট-ডক করার জন্য। তারপর এখানে ওখানে ঘুরে একটা বিদেশি ব্যাঙ্কের মেজ কর্তা হয়ে ফিরে এলাম দিল্লিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী কঙ্কণাকে বিয়ে করে চিত্তরঞ্জন পার্কে বাবা যে বাড়ি করেছিলেন তার উপর আর একটা তলা তুলে পাকাপাকি দিল্লিবাসি হয়ে গেলাম। কলকাতা ছাড়ার পর কিছুদিন বাসব আর চন্দনের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিলো। কিন্তু ক্রমশঃ সেটা কমতে কমতে একসময় একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। খবর পেয়েছিলাম বাসব বম্বে থেকে এম-ডি করে ইংল্যান্ড গেছে এম-আর-সি-পি পড়তে। আর চন্দন শিবপুর থেকে এম-ই করে আফ্রিকার কোন একটা দেশে কয়েক বছর চাকরি করে রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ করছে। প্রত্যেক বছর নয়ই মার্চ আসে আর কঙ্কণা মনে করিয়ে দেয় আর দশ বছর .... আর পাঁচ বছর .... আর এক বছর। উনিশ-শো ছিয়াশি সাল এসে গেলো। ফেব্রুয়ারি মাসে আটই মার্চের একটা প্লেনের টিকিট কেটে রাখলাম। দমদমে নেমে সোজা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে চলে এলাম। আগে থেকে ঘর বুক করা ছিলো। আট তারিখ রাতে ভালো ঘুম হলো না। বার তিনেক ঘুম ভেঙে গেলো। অবশেষে পাঁচটার সময় বিছানা ছেড়ে গরম জলে ভালো করে স্নান করে ছটা নাগাদ এক কাপ কফি খেয়ে হোটেলের বাইরে এলাম। একটা ট্যাক্সি ধরে যখন স্কুলের বড় দরজার সামনে পৌঁছলাম তখন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে। দূর থেকে দেখতে পেলাম চন্দন পায়চারি করছে। দু-মিনিটের মধ্যে বাসব হাজির হলো। ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে বললো - তাহলে তিরিশ বছর আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা তিনজনেই রাখতে পেরেছি। চন্দন বললো - আমাদের কলকাতার বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে। তাতে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। আমি দু-দিন আগে কলকাতায় এসে বাড়িটা পরিষ্কার করে রেখেছি। আমরা সেখানে গিয়ে আড্ডা দিতে পারি। এ ছাড়া আমার বাবার শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লিতে একটা বাড়ি আছে। তার চাবিও আমি নিয়ে এসেছি। দু-দিন

শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে আসতে অসুবিধা নেই। আমি বললাম - শান্তিনিকেতনই ভালো। গোলমাল নেই। বাসব বললো - আজকে আকাশে বেশ মেঘ। বৃষ্টি হতে পারে। চন্দন বললো - শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি দেখা একটা অভিজ্ঞতা। শান্তিনিকেতনে যাওয়া যাক। তোরা তো বললি হোটেলে উঠেছিস। চেক-আউট করে হাওড়া চল। দশটা নাগাদ ভালো ট্রেন আছে।

(৩)

ট্রেন একটু দেরিতে চলছিলো। বোলপুর দুপুর একটা নাগাদ পৌঁছলাম। স্টেশনে লাঞ্চ করে আমরা যখন চন্দনদের বাড়িতে হাজির হলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। বাড়ির কেয়ারটেকার রামসেবক ঘর খুলে পরিষ্কার করে দিলো। চন্দনকে বললো - আজ মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। সন্ধ্যায় ঝড় উঠলো। মিনিট দশেক ঝড় সব লণ্ডভণ্ড করে দিলো। আলো নিভে গেলো। রামসেবক একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে বললো - ইলেকট্রিকের তারে নিশ্চয়ই গাছ পড়েছে। আজ রাতে আর আলো আসবে না।

ডিনার খেয়ে আমরা তিনজনে বারান্দায় বসলাম। বারান্দাটা বেশ বড়ো। ঝড় অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। এখন বৃষ্টিও নেই। চন্দন বললো - বাসব তোর অভিজ্ঞতা আমাদের দু-জনের চেয়ে বেশি। ঝুলি থেকে একটা গল্প বার কর না। সময়ও কাটবে আর গল্পও শোনা যাবে। বাসব বললো - ডাক্তার হিসাবে রুগিদের গোপন কথা অন্যদের বলা রীতি বিরুদ্ধ। তবে নাম ধাম গোপন রেখে একটা গল্প বললে হিপোক্রাটিক ওথ নিশ্চয়ই ভাঙা হবে না। আমার চেম্বারে গ্রীক চিকিৎসক ও দার্শনিক হিপোক্রাটিসের তৈরি এই ওথের আধুনিক সংস্করণ ঝোলানো আছে।

বাসব কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলো, তারপর বলতে সুরু করলো। আমার গল্প সুরু করার আগে একটা ভূমিকা আছে। ফার্স্ট এম-বি-বি-এস পরীক্ষা দিয়ে ঠিক করেছিলাম আমি মেডিসিনে স্পেশালিস্ট হবো। মেডিসিনের এম-ডি করে ইংল্যান্ড গেলাম এম-আর-সি-পি পড়তে। দুটো ঘটনা আমার জীবনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিলো। আমাদের হাসপাতালে জি-পিদের কাছ থেকে রেফার্ড কেসগুলি আসতো। একদিন সকালে আমার স্ক্রিন করার ডিউটি ছিলো। অর্থাৎ যে কেসগুলি আসছে সেগুলি দেখে দরকার হলে পরীক্ষা করে বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া। এক ভদ্রমহিলা এলেন। নামটা এখনও মনে আছে। তবে গল্পের প্রয়োজনে তার দরকার নেই। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। মাঝে মাঝে ঘাড়ে, পিঠে ব্যথা হচ্ছে। একস্-রে প্লেট দেখলাম। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। ভাবছি কি করা যায়। হঠাৎ পিঠে কে হাত দিলো। ঘুরে দেখি প্রফেসর বিশপ। আমাদের মেডিসিনের হেড। গায়ে ল্যাব কোট। পকেট থেকে স্টেথো উকি দিচ্ছে। গোলগাল চেহারা। মাথায় একটাও চুল নেই। মুখে হাসি লেগেই আছে। ইউরোপের সব ডাক্তাররা তাঁকে এক ডাকে চেনেন। শোনা যায় স্বর্গের দেবতারা নাকি তেমন

বিপদে পড়লে মানুষের রূপ ধরে বিশপের কাছে আসেন চিকিৎসার জন্য। আমাদের মেট্রন ক্যাথরিন অলিভার একবার নাকি হাতেনাতে এক দেবতাকে ধরে ফেলেছিলেন। দেবতা কোনোক্রমে সে যাত্রা অদৃশ্য হয়ে ক্যাথরিনের হাত থেকে মুক্তি পান। বিশপ আমাকে বললেন - ডক কি বুঝছো? আমি বললাম - ঘাড়ে ব্যথা বলছে। ঘাড়ের একস্-রে একদম স্বাভাবিক। বিশপ বললেন - তুমি অনুমতি দিলে আমি পেশেন্টকে একবার দেখতে পারি। আমি বললাম - সে কি? আপনি দেখবেন, অনুমতির কি প্রয়োজন আছে। বিশপ বললেন - শোনো, এই ভদ্রমহিলা তোমার পেশেন্ট। তুমি যদি কেসটা আমাকে রেফার করো তাহলে আমি দেখতে পারি। আর আমি যদি নিজে থেকে এই ভদ্রমহিলাকে পরীক্ষা করতে চাই তবে তোমার অনুমতির অবশ্যই প্রয়োজন। আমি বললাম - আপনি অনুগ্রহ করে দেখুন। বিশপ একস্-রে প্লেটটা আলোর সামনে তুলে ধরলেন। তারপর ভদ্রমহিলাকে বললেন - ম্যাডাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার পেটে হাত দিয়ে পরীক্ষা করবো। ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। বিশপ প্রায় দু-মিনিট ধরে ভদ্রমহিলার পেটের বাঁ-দিক থেকে ডান-দিক ও তারপর ডান-দিক থেকে বাঁ-দিক কয়েকবার পরীক্ষা করলেন। উল্টোদিকে একটা টেবিল ছিলো। তার সামনের চেয়ারে বিশপ বসলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখটা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে বিশপ বললেন - গল ব্লাডারে স্টোন। আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন - তুমি গল ব্লাডারে স্টোন লিখে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে কেসটা আমাকে রেফার করে দাও। বিশপ আমার লেখার তলায় লিখলেন, আমি একমত। সার্জিকালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমাকে বললেন - তোমার ডিউটি তো দুটো পর্যন্ত। তারপর লাঞ্চ করতে যাবে। লাঞ্চের পর কফি খেতে আমার ঘরে চলে এসো। গল্প করতে করতে কেসটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। তিনটা নাগাদ বিশপের ঘরে গেলাম। বিশপ নিজেই দু-মগ কফি তৈরি করে আনলেন। ওঁর টেবিলের বাঁ-দিকে একটা ব্ল্যাক বোর্ড ছিলো। ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টার উপর ক্লাস নেওয়ার ভঙ্গিতে কেসটা আলোচনা করলেন। ঘাড়ের ব্যথার সঙ্গে গল ব্লাডারের স্টোনের কি সম্পর্ক, হাতের ব্যথার সঙ্গে হার্টের সম্পর্ক পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। শেষে একটা দারুণ কথা বললেন - ডক, পুঁথিগত বিদ্যায় তোমার সঙ্গে আমার কোনো তফাৎ নেই। তুমি গ্রের অ্যানাটমি পড়েছো। আমিও সেই একই বই পড়েছি। বরং তুমি আমার অনেক পরের এডিশন পড়েছো। তফাৎটা কোথায় জানো? অভিজ্ঞতায়। আমার পিছনে আছে চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা। বিশপ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ নিয়ে চাকরি পাওয়া যায় কিন্তু ওয়ার্ডে গিয়ে কাজ শেখার বিকল্প আর কিছু নেই। এরপর আমি ফিরে গিয়ে তিন মাস শরীরের ব্যথা আর তার সঙ্গে রোগের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর পড়াশুনা করলাম। নোট নিলাম। তারপর এই বিষয়ে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বিশপের কাছে গেলাম। বিশপ বললেন - রেখে যাও, সাতদিন পর এসো। সাতদিন পর গেলাম। বিশপ বললেন - এই বিষয়ে আমি একটা বই এডিট করছি। ভেবেছিলাম প্রথম প্রবন্ধটা আমি নিজেই লিখব। এখন দেখছি তার দরকার নেই। তোমার লেখাটা প্রথমে যাবে। লেখাটা আমি দেখে দিয়েছি। মাস ছয় পরে বইটা বের হলো। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ডাক্তারদের সঙ্গে এক সারিতে বসার সুবাদে আমার কিঞ্চিত

খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এবার দ্বিতীয় ঘটনার কথা বলি। ডঃ কাউফম্যান ওদেশের একজন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট। আমি মুখ চিনতাম। তেমন পরিচয় ছিলো না। তিনি একদিন দু-ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। বিষয় মনের অসুখ। শরীরের অসুখ থেকে মনের অসুখ হয়, আবার মনের অসুখ শরীরের অসুখের কারণ হতে পারে - তার বিবরণ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একদিন কাউফম্যানের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম সাইকিয়াট্রিস্ট হতে চাই। কাউফম্যান আমার সঙ্গে একঘণ্টা কথা বললেন। পরে বুঝলাম আমার মেডিসিনের জ্ঞান পরীক্ষা করছেন। আমাকে একটা বাদামি কাগজে মলাট দেওয়া মোটা বই দিয়ে বললেন, বইটা পড়ে দশদিন পরে দেখা করো। বাইরে এসে দেখলাম শার্লক হোমস্ -এর collected works। একটু অবাক হলাম। বইটা মোটামুটি পড়া ছিলো। যাইহোক বইটা আবার খুঁটিয়ে পড়লাম। দশদিন পর আবার গেলাম। কাউফম্যান জিজ্ঞাসা করলেন, একটা বাক্যে বইটার মূল কথাটা বলতে পারো? আমি কিছু না ভেবে উত্তর দিলাম, নিখুঁত পর্যবেক্ষণ আর তার উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা। এখনও মনে আছে কাউফম্যান ক্রিকেটের আম্পায়ারের মতো ডানহাতের তর্জনী আকাশের দিকে তুলে বললেন, কারেক্ট। এই হলো আমার সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ার পিছনের কাহিনী। এখন আমি সকাল বেলায় একটা পলিক্লিনিকে মেডিসিনের কন্সালটেন্ট হিসাবে কাজ করি। আর বিকেলে আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, বাড়িতে চেম্বার। বাসব একটু দম নিলো। চন্দন বললো - ফ্লাস্কে কফি আছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

(৪)

কফি শেষ করে বাসব আবার সুরু করলো। ডঃ কেলকার আমার চেয়ে দশ বছরের সিনিয়র। নিউরো-মেডিসিনে বম্বের এক নম্বর। একদিন একজন বাঙালী ভদ্রলোক, ধরা যাক তার নাম ঘোষ, কেলকারের চিঠি নিয়ে আমার কাছে এলেন - বাসব এই ভদ্রলোকের মাথায় ও ঘাড়ে মাঝে মাঝে ব্যথা হচ্ছে। নিউরোলজিকাল কোনো সমস্যা নেই বলে আমার ধারণা। মনে হয় মনের কোনো অসুখ। ভদ্রলোককে ভালো করে দেখলাম। এক কথায় সুপুরুষ। লম্বা। বয়স চল্লিশ। শরীরে কোনো মেদ নেই। পরিপাটি জামাকাপড়। হাতে একটা ব্রীফকেস। ঘোষ একটা ফাইল আমাকে দিলেন। সুন্দর করে গত দশ বছরের সমস্ত প্রেসক্রিপশন, রিপোর্ট পর পর রাখা আছে। আমি আধঘণ্টা কথা বললাম। ঘোষ দিল্লিতে থাকেন। ডেপুটেশনে বম্বে এসেছেন। বাড়িতে শুধু স্ত্রী। ছেলেমেয়ে নেই। ঘোষকে পরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেলাম না। বললাম, ফাইলটা রেখে যান। তিনদিন পর আসবেন। রাতে ভালো করে ফাইলটা দেখলাম। ভদ্রলোক বছরে দুটো নির্দিষ্ট দিনে দিল্লির রেড ক্রস ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে থাকেন। পরে জেনেছিলাম একটা ওনার জন্মদিন আর একটা ওদের বিয়ের তারিখ। তিন দিন পর ঘোষ আবার এলেন। কথায় কথায় বললেন, সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন কিছু ব্যক্তিগত কাজ করার জন্য। কিন্তু হাতে সেই ব্রীফকেস। মনে পড়লো কাউফম্যান বলেছিলেন রোগ নির্ণয়ের প্রথম ধাপ সঠিক পর্যবেক্ষণ। শনি আর রবিবার আমার ছুটি। সকালে মেয়ের সারা

সপ্তাহের পড়াশুনা দেখি। দুপুরে নিজে পড়াশুনা করি। আর বিকেলে স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে গল্প করি অথবা ওদের নিয়ে বেড়াতে যাই। শনিবার মেয়েকে পড়ানো সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ঘোষকে দশটায় আসতে বললাম। ঘোষ বলেছিল সফট্ ড্রিঙ্ক খেতে খুব ভালোবাসে। শুক্রবার আমি দু-লিটারের এক বোতল সফট্ ড্রিঙ্ক চেম্বারের ফ্রিজে রেখে দিলাম। জার্মানিতে বেড়াবার সময় শখ করে চারটে বড় বিয়ার-মগ কিনেছিলাম। তার দুটো বার করলাম। ঘোষের সঙ্গে গল্প করতে করতে বার বার ওর মগে সফট্ ড্রিঙ্ক ঢেলে যাচ্ছি। আর ঘোষ খেয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা খানেক পর ঘোষ বললো, বাথরুমে যাব। আমি এর জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। আমার চেম্বারের সঙ্গে একটা বাথরুম আছে। সেটা একটা খাঁজের মধ্যে। অর্থাৎ বাথরুমের দরজা খুলে কয়েক পা এগিয়ে চেম্বারের মধ্যে আসতে হয়। বাথরুমের দরজা খুললেই আমার বসার টেবিল দেখা যায় না। ঘোষ বাথরুমে ঢুকতেই আমি ওর ব্রীফকেসটা তুললাম। বেশ ভারি। দেখলাম লক করা। ঘোষ বাথরুম থেকে এসে আবার চেয়ারে বসলো। আমি বললাম, ওজনের যন্ত্রে আপনার ব্রীফকেসটা ওজন করে দেখুন তো। ঘোষ বললো, সাড়ে চার কেজি। আমি জানতে চাইলাম ব্রীফকেসে কি আছে? ঘোষ বললো, কাগজপত্র। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অফিসের? ঘোষ একটু চুপ করে থেকে বললো, না। আমার মা, বাবা আর কাকার মেডিকেল ফাইল আছে। আমি বললাম, এগুলি সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন কেন? ঘোষ বললো, আমি ওদের খুব ভালবাসতাম। কাগজগুলি সঙ্গে থাকলে মনে হয় ওঁরা আমার কাছে আছেন। আমার কথাটা বিশ্বাস হলো না। ভালবাসলে ওঁদের ছবি ব্যাগে রাখা যেতে পারে। মেডিকেল ফাইল রাখার দরকার কি? আমি ঘোষকে বললাম রিপোর্টগুলি কি আমি দেখতে পারি? কারণ পরিবারের মেডিকেল হিস্ট্রি থেকে অনেক সময় রোগ নির্ণয় সহজ হয়। ঘোষ একটু ইতস্তত করলো। তারপর চাবি দিয়ে ব্রীফকেসটা খুলে তিনটা ফাইল আমার হাতে দিলো। দেখলাম ফাইল তিনটা ঘোষের নিজের ফাইলের মত প্রেসক্রিপশন, রিপোর্ট একই ভাবে পর পর সুন্দর ভাবে সাজানো আছে। ঘোষকে আবার তিনদিন পরে আসতে বলে ফাইল তিনটা নিয়ে বসলাম। ঘোষের বাবার গল ব্লাডার বাদ দেওয়া হয়েছিলো। ঘোষের মার হিস্টরেক্টমী হয়েছিলো চল্লিশ বছর বয়েসে। ঘোষের কাকার একবার হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ায় দু-ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছিলো। মনে পড়লো কাউফম্যান বলেছিলেন, পর্যবেক্ষণ করো, ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো, আরও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো, উত্তর নিশ্চয়ই পাবে। রবিবার দুপুরে ফাইলগুলি নিয়ে আবার বসলাম। একটা বড় কাগজে দাগ কেটে টেবিল বানালাম। পার্সোনাল ডাটা, রোগের ইতিহাস পাশাপাশি থাকলে তুলনা করার সুবিধা হয়। হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেলো। এই তো উত্তর পেয়েছি। তিনদিন পরে ঘোষ এলো। বসামাত্র বললাম, আপনার সমস্যা আপনার ব্লাড গ্রুপ নিয়ে, তাই তো? ঘোষ দু-হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, আপনি যে কাহিনী আমাকে বলেন নি সেটা যদি বলেন তাহলে আমার চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়।

ঘোষ ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে বইলো। কিছুক্ষণ সময় নিলো স্বাভাবিক হতে। তারপর বলতে সুরু করলো। ঘোষ ঠিক যে ভাবে বলেছিলো আমি ঠিক ঘোষের মত করে তোদের বলছি।

নিয়মিত রক্ত দেবার সুবাদে রেড ক্রস ব্লাড ব্যাঙ্কের অনেকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো। ওখানকার একজন সোশাল ওয়ার্কার মিসেস পারেখ মাঝে মাঝে আমাকে পড়ার জন্য দেশ বিদেশের নানা বুকলেট, প্যামফ্লেট দিতেন। একদিন একটা চটি বই দিলেন। বইটির নাম Inheritance of Blood Group। কুড়ি পাতার বই। সে দিন বাড়ি ফিরে বইটা পড়ে ফেললাম। খুব সহজ করে লেখা। বাবা মার ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ব্লাড গ্রুপের কি সম্পর্ক পরিষ্কার করে ছবি দিয়ে বোঝানো আছে। নীচের ঘরে আলমারিতে বাবা ও মার মেডিকেল ফাইল আছে। সে দুটো বার করতে আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বাবার ব্লাড গ্রুপ B, মার O আর আমার A। প্রথমে ভাবলাম বইটা পড়ে কিছু ভুল বুঝেছি। বইটা আবার পড়লাম। দু-দিন পর রেড ক্রস অফিসে গেলাম। মিসেস পারেখের সঙ্গে বইটা নিয়ে কথা বললাম। মিসেস পারেখ বুঝিয়ে দিলেন বাবা মার ব্লাড গ্রুপ জানা থাকলে বাচ্চাদের কি গ্রুপ হবে না বলা যায়। কি গ্রুপ হবে তার শুধু প্রোবাবিলিটি বলা যেতে পারে। বলে উদাহরণ দিলেন, বাবা মার ব্লাড গ্রুপ যদি B আর O হয় তাহলে বাচ্চার গ্রুপ B কিম্বা O হবে। A বা AB কখনও হতে পারবে না। এই কথা শোনার পর আমার কপালের দু-দিকের শিরা দপ দপ করতে লাগলো। তারপর থেকে সব সময় মনে হতে লাগলো আমাকে কারা দেখছে। বাড়ি থেকে আমার অনুপস্থিতিতে মেডিকেল রিপোর্টগুলি চুরি করে আমাকে বিপদে ফেলবে। বছর দুয়েক আগে আমার খুড়তুতো বোন বাঙ্গালোর থেকে ফোন করে জানালো যে কাকা মৃত্যু শয্যায়। আমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। অফিসে কাজের চাপ ছিলো। তিনদিন পর যখন বাঙ্গালোর পৌঁছলাম তখন কাকার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুখ দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বের হচ্ছে। পরদিন কাকা মারা গেলেন। আমি দিল্লি ফিরে এলাম। শ্রাদ্ধের সময় আবার বাঙ্গালোর গেলাম। ইতিমধ্যে কাকার উইল খোলা হয়েছে। কাকিমা আর বোনের মুখ ভার। কাকা তাঁর বাড়ির একতলাটা আমাকে লিখে দিয়ে গেছেন। আমি কাকিমাকে বললাম, কাকা ভালবেসে বাড়িটা দিয়েছেন, আমি তা গ্রহণ করলাম। তবে আমি কোনোদিন বাঙ্গালোর এসে থাকবো না। আমি দানপত্র করে তোমাকে বাড়িটা দিয়ে দিতে চাই। মেঘ কেটে গেলো। ফেরার সময় বোন একটা বড় খাম হাতে দিয়ে বললো, বাবা তোকে এই খামটা দিতে বলে গেছেন। দিল্লি এসে দেখলাম কাকার মেডিকেল ফাইল, যেটা আপনার টেবিলে আছে। দেখলাম কাকার ব্লাড গ্রুপ A।

আমি ঘোষকে বললাম, যা হয়ে গেছে তাতে আপনার কোনো হাত নেই। আপনার বাবা মারা গেছেন ন-বছর আগে আর মা গত হয়েছেন তাও পাঁচ বছর হতে চললো। আপনার বাবা আর মার রক্ত পরীক্ষা হয়েছিলো দিল্লির দুটো ল্যাবে। আর আপনার কাকার রক্ত পরীক্ষা হয়েছে

বাঙ্গালোরে। কোনো ল্যাবেই এই রিপোর্টগুলি অনন্তকাল জমিয়ে রাখবে না। আর কেউ এই চারটা রিপোর্ট জোগাড় করে আপনাকে বিরক্ত করবে এমন কথা ভাবার কোনো কারণই নেই। এ সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিন। আমি ড্রয়ার থেকে একটা কাঁচি বার করলাম। ঘোষের বাবা, মা আর কাকার ব্লাড গ্রুপের অংশটা রিপোর্ট থেকে কেটে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। ঘোষকে বললাম, এবার আমি ব্লাড রিপোর্টগুলি ফাইল থেকে বার করছি। আমার সঙ্গে বাথরুমে আসুন। দেশলাই জ্বালিয়ে রিপোর্টগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিন। এবার আপনি নিশ্চিন্ত তো? ঘোষকে আরও বললাম, এরা সবাই গত, এই মেডিকেল রিপোর্টগুলি আপনার কোনো কাজে আসবে না। এগুলি আমার কাছে থাক, কোনোদিন যদি প্রয়োজন হয় আমার কাছ থেকে দিয়ে যাবেন। আর আপনি এই ভারি ব্রীফকেসটা ব্যবহার করবেন না। বাড়িতে আপনার চোখের আড়ালে কোথাও রেখে দেবেন বা কাউকে দিয়ে দেবেন। আমি আপনাকে কনফারেন্স থেকে পাওয়া একটা হালকা ব্যাগ দিচ্ছি। এতে করে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে অফিসে যাবেন। বাসব চুপ করলো।

আমি বললাম - ঘোষকে কোনো ওষুধ দিলি না। বাসব বললো - ওষুধ না দিলেও হতো। কিন্তু তাতে ওঁর মনের রোগ সারতো না। ঘোষকে বললাম, রোজ আটটার সময় ডিনার করবেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা করে হাঁটবেন, সম্ভব হলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। রাত সাড়ে নটার সময় এক গ্লাস দুধ খাবেন। আর দশটার সময় এই ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়বেন। ঘুমটা একটু গাঢ় হবে। দু-সপ্তাহ রোজ, তার পরের দু-সপ্তাহ সোম, বুধ আর শুক্র, তার পরের দু-সপ্তাহ সোম আর বৃহস্পতি, তার পরের দু-সপ্তাহ শুধু বৃহস্পতি। তারপর আর ওষুধ খেতে হবে না। আমার কাছেও আর আসবার দরকার নেই।

চন্দন বললো - তারপর? বাসব বললো - তার আর পর নেই। আমি বললাম - ঘোষের সঙ্গে তোর আর দেখা হয়নি? বাসব বললো - এর মাস আট পর কুপারেজে রোভার্স কাপের ফাইনাল খেলা দেখতে গেছি। ইস্টবেঙ্গল খেলছে। গেটের মুখে ঘোষের সঙ্গে দেখা। হাত জোড় করে নমস্কার করলো। ওঁর মুখে চওড়া হাসি বলে দিলো কেমন আছেন প্রশ্ন করার আর দরকার নেই।

পুব দিকে আলো ফুটতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি আছে। আকাশে মেঘ কেটে গেছে। গরম কমেছে। বরং একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। তারাদের নরম আলোয় আকাশ চকচক করছে। চন্দন বললো - কাল তো অফিস যাওয়ার তাড়া নেই, এখন ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

October 2011